অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের পটভূমিতে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের অবস্থান ও গুরুত্ব : এক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিপাত

বীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাষান্তর : **প্রসূন বর্মন**

প্রস্তাবনা :

আমি আজকের বক্তৃতার সূচনা করতে চাইছি সারস্বত-সাধনার প্রতি সমর্পিতপ্রাণ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের পুণ্য স্মৃতিতে আমার সশ্রদ্ধ ও বিনম্র প্রণিপাতের মাধ্যমে। গত শতকের শুরুর দশকগুলিতে অসমের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জগতে যে-দিক্‌সন্ধানী নতুন চেতনার সঞ্চার হয়েছিল তার প্রধান উদ্‌গাতা ও হোতাদের মধ্যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ছিলেন অন্যতম। অসমের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেও এই মনীষীর প্রাপ্য স্বীকৃতি না-পাওয়ার বিষয়টি বেশকিছুদিন আগেই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। অসমের বুদ্ধিজীবী সমাজে পদ্মনাথের মতো একজন অসাধারণ পণ্ডিতকে কেন অনাদৃত, এমন-কি অবহেলিতও হতে হয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহের আধারে তার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা খোঁজার জন্য আমি চেষ্টা চালিয়ে আসছিলাম। একসময়ে আমি এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদকে "a victim of misunderstanding" অর্থাৎ ভুল বোঝাবুঝির বলি হতে হয়েছিল। 'পদ্মনাথ অসমিয়া বিদ্বেষী এবং অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যের স্বতন্ত্রতা-রক্ষার বিরোধী' — তাঁর বিষয়ে অসমিয়া সমাজে একসময়ে দৃঢ়নিবদ্ধ এক ধারণার কারণেই সেটা হতে পেরেছিল। বাঁহী-তে (১ম বছর ৯ম-১২শ সংখ্যা, ১৮৩২ শক) প্রকাশিত একটি রচনাই এতে অনেকখানি ইন্ধন জুগিয়েছিল। সেই রচনাটির শিরোনাম ছিল : "অসমীয়া গৌরীপুরত বঙলা সাহিত্য-সভা"।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সেই তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক স্থিতি গ্রহণের পরে আজ পর্যন্তও যে কোনো-কোনো মহলে পদ্মনাথের বিষয়ে এক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব রয়ে গেছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পদ্মনাথ তাঁর চিন্তা, মনন ও কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির অধ্যয়নের প্রতি যে-অবদান রেখে গেছেন তার জন্য আমাদের কাছ থেকে তাঁর বিরাগ বা অবহেলা নয়, সমাদর ও কৃতজ্ঞতাই পাওয়া উচিত বলে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। আমার এই বিশ্বাসের কথা একটা সাক্ষাৎকারে আমি এইভাবে ব্যক্ত করেছিলাম :

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কৃত সমালোচনার পরে আজ পর্যন্ত একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব রয়েছে দেখা যায় — সত্যিই তেমন ছিলেন নাকি তিনি? কিন্তু পদ্মনাথের অন্য একটা দিকও বোধহয় সামান্য হলেও অবহেলিত। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির [অন্যতম] প্রতিষ্ঠাতা,

কামরূপশাসনাবলীর প্রণেতা পদ্মনাথ অসম সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন সে-কথা বিভিন্ন বরেণ্য অসমিয়া সাহিত্যিকরা লিখে রেখে গেছেন। অতুলচন্দ্র বরুয়া প্রণীত *শরৎচন্দ্র গোস্বামী* নামক জীবনীগ্রন্থে এইরকম তথ্য পাওয়া যায়। সাহিত্যাচার্য অতুলচন্দ্র হাজরিকা *অসম সাহিত্য সভার রূপরেখা* (পৃ. ১৪) গ্রন্থে 'অসম সাহিত্য সভা স্থাপনর পূর্বরঙ্গ' শিরোনামে লিখেছেন :

"সেই উপলক্ষে যোরহাটে উপস্থিত অসমের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিষ্ণুরাম হল-এ সমবেত হয়ে একটি অসমিয়া সাহিত্য সভা ... স্থাপনের জন্য কথাবার্তা শুরু করেছিলেন। মেঘের গর্জনই সার, বর্ষণ আর হল না। ওই বছরই গুয়াহাটির অঃ ভাঃ উঃ সাঃ [অসমিয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী] সভার এক বৈঠকে অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'অসম সাহিত্য সম্মিলন' গঠন করে সেখান থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রতিনিধি পাঠানোর এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তবে, মূলত প্রধান সাহিত্যিকদের বিরোধিতায় সেই প্রস্তাবও বুদ্‌বুদের মতো উড়ে গেল।"

(*"সেই উপলক্ষে যোরহাটলৈ যোয়া অসমর বিভিন্ন স্থানর মুখিয়াল লোকসকলে বিষ্ণুরাম হলত গোটখাই এখন অসমীয়া সাহিত্য সভা... পাতিবলৈ কুরুংকারাং করিছিল। মেঘে গাজিলে, কিন্তু বরষুণ নহ'ল। সেই চনতে গুয়াহাটীর অঃ ভাঃ উঃ সাঃ সভার এক বৈঠকত অধ্যাপক পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদে 'অসম সাহিত্য সম্মিলন' এখন গঠন করি তার পরা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনলৈ প্রতিনিধি পঠাবর বাবেও এটা প্রস্তাব দিছিল। পিছে, ঘাইকৈ প্রধান সাহিত্যিকসকলর বিরোধিতাত সেই প্রস্তাবো ফুটুকার যেন হৈ উরি গ'ল।"*

এ-ক্ষেত্রে পদ্মনাথের সদর্থক ভূমিকার বিষয়ে রত্নকান্ত বরকাকতী লিখেছেন :

"১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমি কটন কলেজের প্রথম বর্ষে ভরতি হই। তার কিছুদিন আগে সংস্কৃতের প্রফেসর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুগ্রহে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে [বর্ধমানের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে] আমিও হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রনাথ শর্মা এবং সর্বেশ্বর কটকীর সঙ্গে 'হাফ কনসেশন' টিকিটে ডেলিগেট হিসাবে যাওয়ার সুবিধা পেয়েছিলাম। সেই বর্ধমান সাহিত্য সম্মিলন দেখার ফলেই আমি, চন্দ্রনাথ শর্মা এবং অম্বিকা রায়চৌধুরী — এই তিনজনের সম্মিলিত চেষ্টায় অসম সাহিত্য সম্মিলনেরও জন্ম হল বলা যায়। আমাদের কল্পনা-গর্ভস্থ অসম সাহিত্য সভা শিবসাগরে পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার সভাপতিত্বে ১৯১৭ সালে ভূমিষ্ঠ হল।" (*রত্নকান্ত বরকাকতী রচনা-সম্ভার, 'আত্মবাণী'*)

(*"১৯১৫ খৃষ্টাব্দর জুলাই মাহত মই কটন কলেজর প্রথম বার্ষিকত ভর্ত্তি হওঁ। তার অলপ আগতে সংস্কৃতর প্রফেছর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়র অনুগ্রহত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দত [বর্দ্ধমানর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনলৈ] ময়ো হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রনাথ শর্মা আরু সর্বেশ্বর কটকীরে সৈতে 'হাফ কনচেছন' টিকতত ডেলিগে'ট হিচাবে যাবলৈ সুবিধা পাওঁ। সেই বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলন দর্শনর ফলতে মই, চন্দ্রনাথ শর্মা আরু অম্বিকা রায়চৌধুরী — এই তিনিজনর যুটীয়া যত্নর ফলতে অসম সাহিত্য সম্মিলনরো জন্ম হ'ল বুলিব লাগে। আমার কল্পনা-গর্ভস্থ অসম সাহিত্য সভা শিবসাগরত পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার সভাপতিত্বত ১৯১৭ চনত ভূমিষ্ঠ হ'ল।"*) (রত্নকান্ত বরকাকতী রচনা-সম্ভার, 'আত্মবাণী')

এইখানে আমি পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জীবন ও কৃতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরতে চাইছি।

পদ্মনাথের জন্ম হয়েছিল শ্রীহট্টের বানিয়াচং গ্রামে ১৮৬৮ সালে। ছোটবেলা থেকেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সেই সময়কার অসমের মধ্যে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ১৮৮৮ সালে এফ.এ. পাশ করেন। তারপর ঢাকা কলেজে বি.এ. শ্রেণিতে ভরতি হন। ১৮৯০ সালে তিনি তিনটে বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। কিছুদিন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়ার পরে ফের ঢাকায় গিয়ে ১৮৯২ সালে ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। সেই সময়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য ঢাকা সারস্বত সমাজ তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি প্রদান করে, যা পরে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে রূপান্তরিত হয়।

১৮৯৩ সালে পদ্মনাথ সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। সেখানে তিনি একাই চারটে বিষয়ে পাঠদান করতেন — ইংরেজি, সংস্কৃত, লজিক ও ইতিহাস। সেই সময়ে তিনি শিলঙে অসম সচিবালয়ে কেরানি হিসাবে যোগ দিয়ে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত সেখানে থাকেন। শিলঙে থাকাকালীন তিনি শিলঙের বঙ্গীয় সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে

জড়িত হয়ে পড়েন। তখনই তিনি এডোআর্ড গেইটের *History of Assam*-এর এক সমালোচনা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। তিনি সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সুরমা উপত্যকার ডি.আই. অব স্কুল্‌স হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। এখানেও উপরওয়ালার সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তাঁকে গুয়াহাটিতে বদলি করে লোকগণনার কাজে লাগানো হয়। ১৯০২ সালে তিনি পুনরায় সুরমা উপত্যকায় আগেকার পদে ফিরে যান। তার পরে ১৯০৫ সালে পদ্মনাথের আবেদন অনুযায়ী তাঁকে কটন কলেজে সংস্কৃত ও ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে নিযুক্তি দেওয়া হয়। সেই সময়ে অসমের ইতিহাস প্রণেতা এডোআর্ড গেইটের সহায়করূপে পণ্ডিত হেমচন্দ্র গোস্বামী অসমিয়া প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন। পদ্মনাথের সঙ্গে হেমচন্দ্রের মিলন ঘটল এবং শুরু হল এক সার্থক বিদ্যায়তনিক সহযোগিতার পর্ব।

১৯০৯ সালে গুয়াহাটির বঙ্গীয় সমাজের এক সভায় পদ্মনাথ সর্বসম্মতিক্রমে গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। সেই সভার এক অধিবেশনে পদ্মনাথ 'নিবেদন' নামক যে-নিবন্ধ পাঠ করেন তার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, বঙ্গীয় বহু সাহিত্যসেবী অসমের বিষয়ে নানান উদ্ভট কাহিনি প্রচার করেন। তাঁরা অসম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের বিষয়ে "অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন"। সেইসঙ্গে তিনি সুচিন্তিত মন্তব্য করেছিলেন এইভাবে :

"যেসকল বাঙ্গালী এখানে থাকিয়া আসামের অন্নে পরিপুষ্ট হইতেছে তাহাদের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে প্রচলিত কুসংস্কার দূরীভূত করা এবং এতদ্দেশ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গবাসিগণের গোচরীভূত করা।"

ক্রমে ক্রমে পদ্মনাথ অসমের সমাজ-সংস্কৃতির বিষয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য তথ্য উদ্ধার এবং তার প্রচারের কাজে ব্রতী হয়ে পড়েন। তাঁর নেতৃত্বে গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভার বৈঠকগুলিতে অসম-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়।

এই সভার চতুর্থ অধিবেশনটি এই কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে এখানেই অসমের প্রাচীন শাসনসমূহের লিপির পাঠ এবং তার অর্থ উদ্ধারের পদ্ধতির সঙ্গে পদ্মনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই অধিবেশনেই সুবিখ্যাত অসমিয়া পণ্ডিত ধীরেশ্বরাচার্য বলবর্মার একটি তাম্রশাসন প্রদর্শন করেন এবং সেটা পাঠ করে তার অর্থ ব্যাখ্যা করেন। এর দ্বারা পদ্মনাথ এমনভাবে চমৎকৃত ও অনুপ্রাণিত হন যে তিনি প্রাচীন কামরূপের এই ধরনের অন্যান্য শাসনের পাঠ সংগ্রহ এবং তার অর্থোদ্ধারের কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ শুরু করেন। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত পদ্মনাথের Magnum opus — 'মহৎ কৃতি' *কামরূপশাসনাবলীর* বীজ এইভাবেই রোপিত হয়েছিল। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির জন্মকাহিনিও।

১৯১০ সালের জানুআরি মাসে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় গৌরীপুরে রাজা প্রতাপচন্দ্র বরুয়ার পৃষ্ঠপোষকতায়। অসমের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে প্রতাপচন্দ্রের বদান্যতার কথা সর্বজনস্বীকৃত। রাজা প্রতাপচন্দ্র অসমিয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, অবশ্য সমান্তরালভাবে বঙ্গীয় ভাষা-সংস্কৃতিরও অনুরাগী ছিলেন। সেজন্যই গৌরীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনকে তাঁর আতিথেয়তা দেওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। সে যা-ই হোক, অধিবেশনের সভাপতিরূপে পদ্মনাথ যে-অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন— এবং যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল— সেটাতে সত্যিই অসমিয়া-বিরোধী, অসমিয়া-বিদ্বেষী মন্তব্য ছিল কি? অভিভাষণের মূল পাঠ সে-সময়ে উপলব্ধ না-হওয়ার জন্যই কি তা নিয়ে মনান্তর ঘটেছিল? সেটার কিছু নেতিবাচক বক্তব্য নিয়ে বেজবরুয়ার তোলা আপত্তির প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। এখানে তার ইতিবাচক দিকগুলি স্মরণ করা যাক।

অভিভাষণটির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপের এবং এখনকার অসমের অনন্যতার জয়গান। সেইসঙ্গে প্রতিবেশী অসমের বিষয়ে বঙ্গদেশবাসীদের অজ্ঞতা ও উদ্ভট ধারণার বিরুদ্ধে ধিক্কার।

কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

"বঙ্গদেশবাসিগণ আসাম সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত ধারণা পরিপোষণ করেন, অথচ আসাম তাঁহাদের অতীব সন্নিকৃষ্ট, পূর্বে বহুদিন— এবং সম্প্রতি কিয়দ্দিন যাবৎ পুনশ্চ— তাঁহারা আসামের সঙ্গে একই প্রদেশভুক্ত। [সেই সময়ে Eastern Bengal and Assam নামে একটি প্রদেশ গঠিত হয়েছিল।] সুদূর হিমালয়ের পথে মাসাধিক কাল পর্য্যটনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমের

কাহিনী প্রচারিত করা হইয়াছে, কিন্তু ডিব্রুগড় হইতে পাঁচ ছয় দিনে যে স্থানে পৌঁছা যায়, সেই পরশুরাম ক্ষেত্রের কাহিনী এযাবৎ বঙ্গভাষায় প্রকাশ হইল না। কনিষ্ক ও কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বহু অনুশীলন হইয়াছে— কিন্তু আহোম-আকবর রাজা রুদ্রসিংহের নাম কেহ জানেন কি না সন্দেহ। অমৃতসরের নামকরণ বিবরণ অনায়াসে বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু শিবসাগরের কথা কিছুই বলিতে পারি না।"

আবার :

"আসামে যত প্রকারের জাতি ও রীতিনীতি দেখিতে পাওয়া যায়, যত প্রকারের বিভিন্ন ভাষা ও ভূষা প্রচলিত, যত প্রকারের উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দ্রব্য আছে, বোধহয় ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশে আছে কিনা সন্দেহ।... এইসকল বিষয়ে কোনও রূপ গবেষণা করিতে হইলে, আসামে যত মালমসলা পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা সুদুর্লভ।"

স্পষ্টই বোঝা যায়, অসমের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, *কামরূপশাসনাবলী* গ্রন্থ ছাড়াও পদ্মনাথ রচিত ও প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি ভাষার অন্যান্য প্রবন্ধের তালিকাটি থেকেই অসমের প্রতি তাঁর গভীর মমতার কথা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে।

পদ্মনাথের রচনাপঞ্জি

ক) বাংলা ভাষায় :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

বর্ষ ও সংখ্যা

১। আসাম পর্য্যটন
১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

২। বলবর্ম্মার তাম্রশাসন
১৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

৩। আসাম ভ্রমণ - দ্বিতীয় প্রবন্ধ
১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

৪। আসাম ভ্রমণের পরিশিষ্ট
১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

৫। দীপিকা-ছন্দ (অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ)
১৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

৬। আসাম ভ্রমণ - তৃতীয় প্রবন্ধ
২০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

৭। আসাম ভ্রমণের পরিশিষ্ট
২০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

৮। প্রাচীন কামরূপের রাজমালা
২০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

৯। আসামের পত্র-পত্রিকা
২৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

১০। আসামের নানা কথা
৩০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

ঢাকা রিভিউ পত্রিকা

১। মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়
১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়

বঙ্গদর্শন পত্রিকা

১। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন
সভাপতির অভিভাষণ, গৌরীপুর
১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন

খ) ইংরেজি ভাষায় :

Indian Historical Quarterly

1. Review of Sir Edward Gait's History of Assam
Vol III, No.4, 1927 (December)

2. Early History of Kamarupa by RaiBahadur Kanaklal Barua (Revised)
Vol X, No.3, 1934 (October)

Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal

1. Notes on Some Archaeological Remains of Tezpur 1907

Malabar Quarterly Review

1. Reflections on the Ruins of Tezpur
Vol III, No.3, 1909

2. The Ruins of Maibong in Cachar
Vol X, No.2, 1911

3. Pilgrimage to Parasuram Kunda
March, 1924

(অন্য কিছু রচনার জন্য দেখুন প্রশান্ত চক্রবর্তী, 'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও সাহিত্য', নাইন্‌থ্‌ কলাম, মে ২০১১)

এখন আমরা আবার ফিরে আসি গৌরীপুরে অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের ভাষণ প্রসঙ্গে, যেখানে তিনি এমন কিছু উক্তি করেছিলেন যেগুলোকে প্রত্যাহ্বান জানানো নিজের জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন বেজবরুয়া। বেজবরুয়ার সমালোচনার ভাষা আক্রমণাত্মক ছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য যুক্তিহীন ছিল না। এই ধারণাও সঠিক নয় যে বেজবরুয়া অভিভাষণটির মূল পাঠটি দেখেননি (এক সময়ে আমিও সেই ধারণায় পরিচালিত হয়েছিলাম)। *ফিনিক্স* পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (শরৎ ১৪১১, অক্টোবর ২০০৪) মুদ্রিত মূল পাঠ মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে বেজবরুয়া সেই পাঠ থেকে যথার্থ উদ্ধৃতি দিয়েই তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। পদ্মনাথের 'অগ্রহণযোগ্য' বক্তব্যের কয়েকটি উদাহরণ এই ধরনের : কৃত্তিবাসের রামায়ণ মাধব কন্দলীর রামায়ণের পূর্বে রচিত; চৈতন্যদেবের প্রভাবে অসমে নববৈষ্ণব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়; অসমিয়া ভাষার মান্যরূপ সংস্কৃতমুখী হওয়া উচিত যাতে বাঙালি পাঠকের জন্য তা সহজবোধ্য হয়; অসমিয়াদের বিশেষ কষ্ট ছাড়াই অতি সহজে অসমিয়া ভাষাকে বিদ্যালয় ও আদালতের ভাষা হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল; প্রাচীন অসমিয়া পাণ্ডুলিপিগুলি অসমিয়াদের চেয়ে বাঙালিরা বেশি ভালো করে সংরক্ষণ করতে পারবে।

এটাও সত্য যে ভাষণটিতে পদ্মনাথ অসমিয়া ভাষার স্বতন্ত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। কিন্তু তিনি যেন মুক্তমনে এই স্বতন্ত্রতা মেনে নিতে পারেননি, বরং বঙ্গভাষার মাধ্যমে বাঙালি ও অসমিয়া "বিবাহাদি সূত্রে সম্বন্ধ হইয়া এক হইয়া যাওয়া"র পক্ষপাতী ছিলেন।

অভিভাষণটির শেষদিকে বিদ্যাবিনোদ যেন আত্মপক্ষ সমর্থনে এই কথাগুলো বলেছিলেন। (তিনি নিশ্চয় সচেতন হয়েছিলেন যে তাঁর কিছু উক্তি ও কর্মের ফলে তিনি অসমিয়াদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।) :

"আমার অভিভাষণ আকর্ণনান্তর কোনও কোনও আসামবাসী মহাশয়ের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমরা বুঝি অসমিয়া ভাষা তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে বঙ্গভাষা চলাইবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ ধারণা নিতান্তই অমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। মৎপঠিত অভিভাষণে এবং অসমীয়া প্রবন্ধে ঈদৃশ আশঙ্কার [পরিপোষক] কোনই কথা নাই। আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, অসমীয়া যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।"

আপত্তি? আপত্তির প্রশ্ন ওঠে কীভাবে? এটা যেন অনুগ্রহ করে অনুমতি দেওয়ার মতো কথা।

(পদ্মনাথের গৌরীপুর অভিভাষণের মূল পাঠের জন্য 'ফিনিক্স'-এর উল্লিখিত সংখ্যাটি দেখুন।)

পদ্মনাথের পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার বিশেষ অনুরাগী হয়েও আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে অসমের সম্পর্কে পদ্মনাথের মনে এক ধরনের স্ববিরোধ ক্রিয়া করেছিল। অসমের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, তার মানবকুলের জনগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য এবং বিশেষ করে তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা তিনি যে-উদারতা ও মুগ্ধতায় বর্ণনা করেছিলেন, অসমিয়ার ভাষা সম্পর্কে যেন তার অভাব ঘটেছে। এ-ক্ষেত্রে তিনি সমান অকৃপণ হতে পারেননি।

আর-একটা কথা। পদ্মনাথ যদিও মাঝে মাঝে বঙ্গদেশবাসীদের সমালোচনা করেছেন, নিজেকে অসমবাসী বলেননি। বরং 'আমরা' বলতে তিনি নিজেকে বঙ্গদেশীয়ের সারিতে রেখেছেন— পরোক্ষভাবে হলেও। অথচ পদ্মনাথের সময়ে শ্রীহট্ট অসমের অভিন্ন অঙ্গ ছিল। শ্রীহট্ট বা সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ এবং গুয়াহাটির কটন কলেজ দুটোই ছিল অসম সরকারের অধীন কলেজ। মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে পদ্মনাথ পরে কটন কলেজে আসেন। অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে শ্রীহট্টবাসীগণের নিজেদের অসমবাসী বলে পরিচয় না-দেওয়া— এবং অসমিয়াদের কাছ থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে যাওয়াটা— সেই সময়ের এক "সামাজিক বাস্তব" ছিল।

পরিশেষে পদ্মনাথের গবেষণা-কর্মের এক স্বল্প-চর্চিত দিকের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি : সেটা হল পদ্মনাথের লোকসংস্কৃতি চর্চা। এ-বিষয়ে আগেও আমার খানিকটা ধারণা ছিল, তবে পরবর্তীকালে কিছু বিশদ তথ্য আমার হাতে পড়ায় লোকসংস্কৃতির ছাত্র হিসাবে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি এবং পদ্মনাথের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

১৮৯৮ সাল থেকে সিলেটের ডি.সি. অর্থাৎ জেলাশাসক ছিলেন পেটিয়ার্স নামক একজন বিদ্যানুরাগী ব্রিটিশ অফিসার।

পদ্মনাথের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। সেই সময়ে Crookes নামক একজন ICS অফিসার উত্তর ভারতের বিভিন্ন জেলার লোকাচারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়েছিলেন সরকারি যন্ত্রের মাধ্যমে। সেই অনুসারে পেটিয়ার্সও সিলেট জেলার লোকাচারের তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পদ্মনাথের হাতে ন্যস্ত করেন। পদ্মনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় সেই কাজ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এইভাবে পদ্মনাথ হয়ে পড়েন লোকসংস্কৃতির অনুরাগী ও চর্চাকারী। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি স্থানীয় কাগজপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও ১৮৯৮ সালে 'Folk Customs and Folklore of Sylhet' নামে ইংরেজিতে একটি মূল্যবান নিবন্ধ লেখেন এবং সেটা প্রকাশিত হয় বিখ্যাত Man in India পত্রিকায়, ১৯৩০ সালে (Vol X, No. 2-3)। এইভাবে পদ্মনাথের প্রতি আমার পূর্বের আকর্ষণে আরও এক মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

আমার পরম সৌভাগ্য যে সেই পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের নামাঙ্কিত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই কাজের জন্য আমি কতটা উপযুক্ত সে-বিষয়ে আমার নিজের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমি উদ্যোক্তাদের এই আমন্ত্রণ আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছি এই কারণেই যে, সেই মহান পণ্ডিতের প্রতি আমার বিদ্যায়তনিক ঋণ শোধ করার সুযোগ এর মাধ্যমে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। সেজন্য আমি ন্যাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই সুযোগে আমি রমানাথ ভট্টাচার্য ন্যাসের কর্মকর্তাদের বিবেচনার জন্য বিনম্রভাবে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইছি। তাঁরা পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রস্তুত করিয়ে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। জীবনীটির ইংরেজি, অসমিয়া ও বাংলা তিনটি সংস্করণ হলে ভালো হয় বলে আমি মনে করি।

এই প্রস্তাবনা অংশ শেষ করার আগে আমি আমার দুজন কনিষ্ঠ বিদ্বান-সুহৃদের প্রতি প্রকাশ্যভাবে আমার ঋণ স্বীকার কর্তব্য মনে করছি। পদ্মনাথের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ ছাড়াও সময়ে সময়ে এই প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমার উপকারকারী সেই সুহৃদ দুজনের একজন হলেন শিলচরের নিরলস গবেষক সুপরিচিত পণ্ডিত ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং অন্যজন সদাতৎপর জ্ঞানান্বেষী তরুণ কটন কলেজের বাংলা বিভাগের ড. প্রশান্ত চক্রবর্তী।

এই ক'টি কথায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের স্মৃতি-তর্পণ করার পরে এখন আমি আজকের মূল বক্তৃতার বিষয়ে প্রবেশ করছি।

ভৌগোলিক দিক থেকে গোয়ালপাড়িয়া অভিধাটি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমতম প্রান্তের গোয়ালপাড়া নামে চিহ্নিত এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে এই অঞ্চল ব্রিটিশ প্রশাসিত অসম প্রদেশের এবং স্বরাজোত্তর কালে গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে প্রশাসনিক বিভাজনের পুনর্বিন্যাসের ফলে পূর্বের গোয়ালপাড়া জেলা চারটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে — ধুবুড়ি, কোকরাঝাড়, বঙাইগাঁও ও গোয়ালপাড়া। বোড়োভূমির স্বীকৃতির পরে এই বিন্যাসে আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এইসব প্রশাসনিক পরিবর্তন মেনে নিয়েও গোয়ালপাড়া অঞ্চল বোঝাতে পূর্বতন গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসীরা প্রায়ই 'অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলা' আখ্যাটি ব্যবহার করেন। তার কারণ এটাই যে, ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক গঠন ছাড়াও 'গোয়ালপাড়া' নামটির সঙ্গে অন্য এক বৈশিষ্ট্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে : সেটা হল এই অঞ্চলটির লোকসংস্কৃতি। যেহেতু লোকসংস্কৃতির এক প্রধান উপাদান হচ্ছে লোকগীত সেজন্যে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের চরিত্রের বিচার হওয়া প্রয়োজন গোয়ালপাড়িয়া লোকসংস্কৃতির আধারে। আজ আমি সামগ্রিক অসমিয়া লোকসংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই করার চেষ্টা করব।

আমরা জানি যে অসমিয়া সংস্কৃতি এক সমরূপ (uniform), একপ্রস্তর (monolithic) সংস্কৃতি নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ, সমাহার ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অসমিয়া সংস্কৃতি রূপ পরিগ্রহণ করেছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর দুই পারে নদীটির নামে চিহ্নিত দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত উপত্যকাকেই অসমিয়া সংস্কৃতির 'মান্য' রূপের লীলাভূমি বলে ধরে নেওয়া হয়। অথচ এই মান্য রূপও প্রকৃতার্থে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে তৎসংলগ্ন পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে আহৃত সাংস্কৃতিক উপাদানে পুষ্ট।

আজকের এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে আমার পূর্বের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করতে চাইছি :

"এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই অনেক সময় অসমিয়া সংস্কৃতির এক কাল্পনিক মান্যরূপের আধারে জনগোষ্ঠীগত ও অঞ্চলগত সাংস্কৃতিক সম্পদের বিচার করি এবং তার ফলে সেই তথাকথিত মান্যরূপের সঙ্গে বিসদৃশ উপাদানগুলিকে হয় অস্বীকার করি, নয়তো অবজ্ঞা করি। অর্থাৎ তাত্ত্বিক ও আবেগিক বিচারে আমরা যে-সব সম্পদকে নিজের বলে গৌরব করি, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলিকেই স্বীকৃতি দিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি। এ-ধরনের স্ব-বিরোধ আমাদের মধ্যে আছে বলেই কখনো কখনো ব্যক্তিগত ও সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়।

"গোয়ালপাড়িয়া সংস্কৃতি এবং অসমিয়া সংস্কৃতির স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ-রকম স্ব-বিরোধের দ্বন্দ্ব যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। স্থানীয় কথাবার্তা, বিচার-বিশ্বাস, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির জন্যই গোয়ালপাড়ার সংস্কৃতিকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। অনেকসময় এটা উপেক্ষার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্রূপের এবং সীমিত ক্ষেত্রে হলেও বিদ্বেষেরও বলি হতে হয়েছে। অথচ কোন্ সচেতন অসমিয়া জানেন না এবং গৌরববোধ করেন না যে প্রাচীন অসমের ভূখণ্ড সর্বদাই গোয়ালপাড়া তো বটেই, সেইসঙ্গে সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং প্রায়শ তার পশ্চিমের বহু অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল, প্রাচীন কামরূপের চার পীঠের মধ্যে রত্নপীঠ ও কামপীঠের অবস্থান ছিল প্রধানত এই গোয়ালপাড়াকে ঘিরেই, মধ্যযুগের অসমের গৌরবোজ্জ্বল দিনের কামতা ও কোচ রাজশক্তির লীলাভূমি ছিল এই গোয়ালপাড়া, অসমের সংস্কৃতিতে যিনি অভূতপূর্ব অবদান রেখে গিয়েছেন কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সেই বিশ্বসিংহের জন্ম হয়েছিল এই গোয়ালপাড়ারই চিকনাঝারে, অসমিয়া সংস্কৃতির নব-অভ্যুদয়ের বার্তাবাহী মহাপুরুষদের পুণ্য বিচরণভূমি ছিল গোয়ালপাড়া সহ এই পশ্চিমপ্রান্ত?"

("এইটো স্বীকার করিব লাগিব যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রত আমার বহুতেই বহু সময়ত অসমীয়া সংস্কৃতির এক কাল্পনিক মান্য রূপর আধারত আমার জনগোষ্ঠীগত আরু অঞ্চলগত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহর বিচার করোঁ, আরু ফলত সেই তথাকথিত মান্য রূপর লগত সাদৃশ্য নথকা উপাদানবোরক হয় অস্বীকার করোঁ, নহয় অবজ্ঞা করোঁ। অর্থাৎ, তাত্ত্বিক আরু আবেগিক বিচারেরে আমি যিবোর সম্পদক নিজর বুলি গৌরব করোঁ, ব্যবহারিক দিশত সেইবোরকেই স্বীকৃতি দিবলৈ আমি কুণ্ঠা বোধ করোঁ। এই ধরনর স্ব-বিরোধ আমার ভিতরত আছে বুলিয়েই আমি সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত আরু সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বত ভুগিবলগীয় হয়।

"গোয়ালপরীয়া সংস্কৃতি আরু অসমীয়া সংস্কৃতির স্থান-নির্ধারণর ক্ষেত্রত এনে স্ব-বিরোধর দ্বন্দ্বই ভালেখিনি কাম করিছে। থলুআ মাত-কথা, বিচার-বিশ্বাস, ক্রিয়া-কর্ম আদির কারণেই গোয়ালপারার সংস্কৃতিক সন্দেহর চকুরে চোয়া হৈছে। বহুসময়ত ই উপেক্ষার, কোনো কোনো ক্ষেত্রত বিদ্রূপর আরু সীমিত ক্ষেত্রত হ'লেও, বিদ্বেষরো বলি হ'ব লগা হৈছে। অথচ কোন সচেতন অসমীয়াই নাজানে আরু গৌরব বোধ নকরে যে প্রাচীন অসমর ভুখণ্ডই সদায় গোয়ালপারার তো কথাই নাই, সমগ্র উত্তর বঙ্গকো আরু প্রায়ে তার পশ্চিমর বহু ঠাই সামরি লৈছিল, প্রাচীন কামরূপর চারি পিঠর ভিতরত রত্নপীঠ আরু কামপীঠর অবস্থান আছিল ঘাইকৈ এই গোয়ালপারাকে লৈ, মধ্যযুগর অসমর গৌরবোজ্জ্বল দিনর কমতা আরু কোঁচ রাজশক্তির লীলা ভূমি আছিল এই গোয়ালপারা, অসমর সংস্কৃতিত অপূর্ব অবদান যোগোয়া কোঁচ বংশর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহর জন্ম হৈছিল এই গোয়ালপারারেই চিকনাঝারত, অসমীয়া সংস্কৃতির নব-অভ্যুদয়র বার্তাবাহী মহাপুরুষ সকলর পুণ্য বিচরণভূমি আছিল গোয়ালপারাকে লৈ এই পশ্চিম প্রান্ত?") [দ্র. গোয়ালপারার লোক-সংস্কৃতি আরু অসমীয় সংস্কৃতিলৈ ইয়ার অবদান, ধুবুরী, ১৯৮২]

সাধারণত অসমিয়া সংস্কৃতি মোটামুটি দুটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাজিত — উজান অসম এবং নামনি অসম। ব্রহ্মপুত্রের দুই পারে পূর্ব প্রান্তের তিনসুকিয়া ও ধেমাজি জেলা থেকে শুরু করে শোণিতপুর ও নগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি উজান অসমের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। অনুরূপভাবে মরিগাঁও ও দরং জেলা থেকে শুরু করে পশ্চিম প্রান্তের গোয়ালপাড়া, ধুবুড়ি ও কোকরাঝাড় জেলা পর্যন্ত বিভাজিত অঞ্চলটি নামনি অসমের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। তবে নামনি অসমের ক্ষেত্রে আবার দুটো উপ-ক্ষেত্রের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় : দরং থেকে শুরু করে গোয়ালপাড়ার পূর্ব অঞ্চল পর্যন্ত এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। অন্যদিকে পশ্চিম গোয়ালপাড়ার সংস্কৃতির যে-স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তা সেই ভূখণ্ডের নিকটবর্তী কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত

রংপুর জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমগোত্রীয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে অসমিয়া সংস্কৃতির পশ্চিমের সীমা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অতিক্রম করে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। এই সমগ্র অঞ্চলের সংস্কৃতি অসমিয়া সংস্কৃতির ভাটির ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। এই অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা 'দেশী মানুষি' (দেশী মানুষ) বলে নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা অনুভব করে। প্রকৃতপক্ষে এই 'দেশী মানুষি'দের সংস্কৃতি পুরনো অসমিয়া বা কামরূপী সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করছে। সামগ্রিকভাবে অসমিয়া সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাসে এই 'দেশী' সংস্কৃতির যে-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটাকে ভুললে চলবে না।

এখানে একটি বিশেষ প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে চাইছি। পশ্চিম গোয়ালপাড়া সহ উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন অঞ্চলের স্থানীয় স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গীয় সংস্কৃতির সাদৃশ্যপূর্ণ বিবিধ উপাদান লক্ষ করা যায়; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ওইরকম উপাদানের সবটাই বঙ্গীয় সংস্কৃতি থেকে ঋণরূপে আহৃত বা তার প্রভাবে সৃষ্ট। অঞ্চলটির সমাজ সেই উপাদানগুলিকে নিজস্ব বলেই মেনে এসেছে। অন্যদিকে, অঞ্চলটির স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতিকে বঙ্গীয় মান্য সংস্কৃতির বিচারে 'ব্রাত্য' বলে ধরে নেওয়াটা ছিল সাধারণ ব্যাপার। উল্লেখ করা উচিত যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত পশ্চিম গোয়ালপাড়ার স্থানীয় সমাজ এবং অসমের বাকি অংশের অসমিয়া সমাজের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব ছিল। গোয়ালপাড়িয়া সংস্কৃতি বিষয়ে অসমের বাকি অংশের মানুষের সন্দেহের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এটাও স্বীকার করতে হবে যে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম গোয়ালপাড়ার মানুষ অসমিয়া সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের নৈকট্যের বিষয়ে এক ধরনের দ্বন্দ্বে ভুগত। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সমাজতাত্ত্বিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে সেই দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তবে এখানে তার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। আমাদের আজকের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এই যে ইতিমধ্যেই সেই দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে এবং পশ্চিম গোয়ালপাড়ার মানুষ নিজেদের সম্পূর্ণরূপে অসমিয়া সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত বলে ঘোষণা করে গৌরব অনুভব করে; সেই সমাজটির অসমিয়াত্বের চেতনা এখন অন্যান্য অঞ্চলের অসমিয়া সমাজের অনুরূপ প্রখর।

আমার বক্তৃতার শিরোনামে অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের যে-অবধারণা নিহিত, তার উৎস হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে কিছুক্ষণ পূর্বে বর্ণিত অসমিয়া সংস্কৃতির— বিশেষভাবে অসমিয়া লোকসংস্কৃতির— অসাধারণ বৈচিত্র্য। লোকগীতগুলিকে যে-কোনো গোষ্ঠী বা অঞ্চলের মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। উজান অসম, নামনি অসম এবং তারও পশ্চিমের কিছুটা অন্তর্ভুক্ত করে আমি অসমিয়া সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের যে-ছবিটি তুলে ধরেছি তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় এই বহুল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটির বিভিন্ন প্রান্তে রাশিকৃত লোকগীতের বিপুল সম্ভারের মধ্যে। এই সমস্ত লোকগীত অসমিয়া ভাষায় রচিত হলেও তার প্রতিটিই নিজ নিজ স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র ও একক। অঞ্চল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় প্রভৃতির দ্বারা এই স্বকীয়তা কীভাবে নিরূপিত হয় সেটা কিছু উদাহরণ সহ ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যাক।

অসমিয়া বর্ণহিন্দু সমাজে প্রচলিত গীতের ('গীত-মাতের') যে-রূপ সেটা অসমিয়া মুসলমান সমাজে প্রচলিত গীতের ('গীত-মাত') রূপের অনুরূপ নয়। বিশেষ করে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা বেশি স্পষ্ট। অসমিয়া মুসলমান সমাজে এমন কিছু বিশেষ শ্রেণির গীত-পদ আছে যেগুলো সেই সমাজের বিশেষ সম্পদ— যেমন, উজানের মুসলমানদের 'জিকির-জারি' এবং দরঙের মুসলমানদের 'চেরা ঢেক'। সেইরকমভাবে অসমিয়াভাষী উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহের গীতকে অ-উপজাতীয় অসমিয়া সমাজের গীত থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। উজানের সোনোয়াল-কাছাড়ি, অসমিয়াভাষী দেউরি, নামনির সমতলের তিওয়া এবং পাতিরাভাদের গীতে নিজস্ব ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়ে আসছে। আবার, কয়েকটি উপজাতীয় গোষ্ঠী দ্বিভাষী : তারা নিজেদের মধ্যে নিজস্ব উপজাতীয় ভাষায় কথা বললেও বাইরে ভাববিনিময়ের জন্য স্থানীয় অসমিয়া ভাষার রূপই প্রয়োগ করে। এদের মধ্যেও উপজাতীয় গুণবিশিষ্ট অসমিয়া গীতের বেশকিছু উদাহরণ পাওয়া যায়।

আমরা গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের বিশেষ ভুবনে প্রবেশের প্রাক্কালে গোয়ালপাড়ার— বিশেষ করে এর পশ্চিম অঞ্চলের— জনবিন্যাস, প্রশাসনিক এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক শ্রেণি-বিভাজন, ধর্মীয় আচার-বিশ্বাস ইত্যাদির প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহের সন্ধান নেওয়া এই কারণেই প্রয়োজন মনে করছি যে, সেইসব বিষয়ে অন্তত মোটামুটি ধারণা না-

থাকলে বিশেষ বিশেষ শ্রেণির লোকগীতের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবনে অসুবিধা হবে।

গোয়ালপাড়া অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কোচ-রাজবংশী গোষ্ঠীর প্রাধান্য মনে রাখার বিষয়। এই গোষ্ঠীর মানুষেরা বর্ণহিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের অধিকাংশই বোড়ো, রাভা প্রভৃতি উপজাতীয় গোষ্ঠী থেকে এই সমাজে প্রবেশ করেছে— ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। শেষতমভাবে এই গোষ্ঠীর মানুষদের গরিষ্ঠাংশই উপজাতীয় হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি সমর্থন করে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কলিতা প্রভৃতি 'উচ্চ' বর্ণের লোকেরা সংখ্যায় কম হলেও প্রভাবের দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে। কৈবর্ত, কুমার, হিরা, মালি অর্থাৎ শোলাশিল্পীর বৃত্তিধারীদেরও সমাজে বিশেষ বিশেষ স্থান আছে।

জেলাটিতে স্থানীয় মুসলমান মানুষের জনসংখ্যার অনুপাতও বেশি। তারা ধর্মের দিক থেকে ইসলামের অনুগামী হলেও সংস্কৃতির দিক থেকে একশো শতাংশই 'দেশী'। তারা পূর্ববঙ্গীয় মূলের মুসলমানদের 'ভাটিয়া' নামে চিহ্নিত করে নিজেদের স্বকীয় সত্তার পরিচয় দেয়।

কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত না-হলেও অঞ্চলটির সামাজিক-সাংস্কৃতিক গাঁথনিতে দুটো বিশেষ বৃত্তির গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তার একটা হল বন্য হাতি শিকার ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত 'মাউত-ফান্দি'র বৃত্তি (মাহুতের এবং ফাঁদে ফেলে হাতি ধরার কাজ) এবং অন্যটা হল মোষের গোয়ালে মোষের দেখাশোনার দায়িত্বে নিযুক্ত 'মৈষাল' (মহিষপালক) বা মোষ-গোয়ালার বৃত্তি। এ-ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ আগ্রহের বিষয়টা এই যে একদিকে হাতি-ফান্দির জীবনকে কেন্দ্র করে এবং অন্যদিকে মৈষালের জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত কয়েকটি অত্যন্ত আকর্ষক লোকগীত, যেগুলো গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

অঞ্চলটির অধিকাংশ মানুষই অবশ্য মূলত কৃষিজীবী, তারা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত না-হলেও অন্যভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া অঞ্চলটির সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনধারায় এমন একটা বিশেষ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল যেটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্য অংশে অপরিচিত ছিল— তা হল জমিদারি প্রথা। এই প্রথা সমাজকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছিল: বিভিন্ন স্তরের জমির মালিক এবং জমির ওপর অধিকারবিহীন কৃষিকর্মী। জমিদারি প্রথার বিলোপ হলেও সেই প্রথার প্রভাবের অবশিষ্টাংশ এখনও সমাজে কিছু কিছু রয়ে গেছে। মনে রাখার বিষয় হল, বেশকিছু গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতে জমিদারি প্রথার সঙ্গে যুক্ত সামাজিক জীবনের চিত্র অক্ষুণ্ণ আছে।

সেইরকমভাবে অঞ্চলটির বিবাহপ্রথার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো বিবাহ-আশ্রিত লোকগীতের অন্দরমহলের সংবাদ পেতে সাহায্য করে। এই অঞ্চলের বহু গীতে 'পণ', 'ঘটক', 'বেচেয়া (বিক্রি করে) খাওয়া' প্রভৃতি অভিধার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যেগুলোর সঙ্গে অঞ্চলটির বিবাহ-পদ্ধতির সম্পর্ক রয়েছে। পণ শব্দের মূল অর্থ হল 'গা-ধন' (bride-price বা স্ত্রী-ধন)— পাত্রীর জন্য পাত্রপক্ষের দেওয়া ধন বা অন্য ধরনের মূল্যই হল পণ। ধন বা মূল্য নিয়ে পাত্রীকে বিদায় দেওয়া হয় বলে একে বিক্রি করার তুল্য বলে ধরা হয়। সেজন্যই মেয়ের বিয়ে দেওয়াকে 'বেচেয়া খাওয়া' (বিক্রি করা) বা 'বিলিয়া খাওয়া' অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা হয়। আজকাল অবশ্য উলটোভাবে পাত্রপক্ষকেই টাকাপয়সা বা অন্য মূল্যবান সামগ্রী দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়। তবুও বেচেয়া খাওয়া কথাটির প্রচলন এখনও আছে— বিশেষ করে লোকগীতে। সেইভাবে একসময়ে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ সাধনে ঘটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তার নিদর্শন এখনও লোকগীতে রয়ে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে বিবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে পরোক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত অন্য একটা সমাজ-বাস্তবতার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায়। আগে অনেক সময় প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কমবয়সি কনেকে বেশি বয়স্ক, এমন-কি বুড়ো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত, স্বামীর সঙ্গে অসন্তুষ্ট যুবতী নারীর তরুণ পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটাও ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। সেজন্যই বহুসংখ্যক গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের উপজীব্য হল পরকীয়া প্রেম। আবার, বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে বিবাহিতা বহু তরুণীকে অকালবৈধব্যের গ্রাসে পড়তে হয়েছিল। অতৃপ্ত কামনার বলি যুবতী বিধবার পুরুষ-সঙ্গ লাভের বাসনার প্রকাশও কিছু কিছু গীতে পাওয়া যায়। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত বিবাহ ইত্যাদি সহ জীবনচক্রের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন গীতের চরিত্র অসমের অন্যান্য অঞ্চলের গীতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও পশ্চিম ভূভাগের বিয়ের গীতের এমন এক বিশেষ শ্রেণি আছে যা অন্য অঞ্চলে প্রায় শোনাই যায় না। সেটা হল মুসলমানি বিয়ের গীত। স্থানীয় মুসলমান সমাজে

কন্যেকে কেন্দ্র করে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী মহিলারা নেচে নেচে যে-সব গীত গায় সেগুলোর আবেদন অসাধারণ।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সামাজিক রীতি-নীতির বিচারে গোয়ালপাড়ায়— বিশেষত পশ্চিম এলাকায় বিশেষ ধরনের এমন কিছু উপাদান আছে যেগুলো অন্যান্য অঞ্চলে অনুপস্থিত। সেই ধরনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে 'কাতি' (কার্তিক) পূজা, 'হুদুম দেও' (হুদুম দেব) পূজা, বাঁশ পূজা এবং সোনারায় পূজা। কাতি-পূজা হল সন্তানহীনা বিবাহিত মহিলার সন্তান-কামনা এবং পুত্রসন্তানহীন মাতার পুত্রসন্তান কামনায় আয়োজিত এক নারী-প্রধান অনুষ্ঠান। হুদুম দেও পূজা অন্য এক নারী-প্রধান অনুষ্ঠান যা অনাবৃষ্টির সময়ে গোপন ধরনের আচারে লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর রাতে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বাঁশ-পূজা হচ্ছে প্রজনন-ভাবনায় পুষ্ট এক পুরুষ-প্রধান অনুষ্ঠান। এই তিন ধরনের অনুষ্ঠানেই কমবেশি 'অশ্লীলতা'র প্রকাশ রয়েছে— যেটাকে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করা হয়। সোনারায়-পূজা হল ব্যাঘ্র-দেবতা সোনারায়কে তুষ্ট করার জন্য প্রধানত রাখাল ছেলেদের অংশগ্রহণের অনুষ্ঠান। এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই কাহিনিমূলক ও অন্যান্য ধরনের গীত (সঙ্গে নৃত্য) পরিবেশন করা হয়।

গোয়ালপাড়ার বিভিন্ন প্রান্তে জনপ্রিয় কুশান-গান, পালা-গান, ভারি-গান প্রভৃতি লোকনাট্যগুলিতে কাহিনি-চক্রের গীত ছাড়াও পয়ার, চটকা, খেমটা ইত্যাদি বিভিন্ন রূপের ও রসের সমাবেশ ঘটে।

লোকগীতের আলোচনায় ভাষা— বিশেষত স্থানীয় কথ্য ভাষার প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। যখন আমরা সাধারণীকরণ করে অসমিয়া লোকগীতের কথা বলি তখন এই ভাষিক বা উপভাষিক দিকটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিই না। সামগ্রিকভাবে অসমিয়া লোকগীতের সমস্ত উপাদান অসমিয়া ভাষাতেই প্রকাশিত এটা ঠিক, কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও সত্য যে এই সবগুলিরই অসমিয়া ভাষা সমরূপের নয়। উজান থেকে নামনি পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকগীতগুলি ভাষাটির ক্ষেত্রীয় ও জনগোষ্ঠীগত বিশেষ বিশেষ রূপে রচিত। অর্থাৎ আমরা অসমিয়া লোকগীতের যে-বৈচিত্র্যের কথা বলছি তা শুধু লোকগীতের শ্রেণির বিভিন্নতা ও প্রাচুর্যের ওপরই নির্ভর করে না, কথ্য ভাষার স্বকীয়তাতেও সেই বৈচিত্র্য অতিরিক্ত মাত্রা এনে দেয়। উজান অসমের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে ছোট-ছোট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভাষার ক্ষেত্রে এক সমরূপতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু নামনি অসমে তার জায়গায় দেখা যায় প্রায় বিভ্রান্তিকর ভাষিক পরিস্থিতি : এখানে দরঙি, মরিগঞা (মরিগাঁওয়ের), পূর্ব কামরূপী, পশ্চিম কামরূপী, পূর্ব গোয়ালপাড়িয়া, মধ্য গোয়ালপাড়িয়া, পশ্চিম গোয়ালপাড়িয়া ইত্যাদি রূপ তো রয়েছেই, তা ছাড়া এগুলোর বাইরেও রয়েছে বিভিন্ন উপরূপ। সে যা-ই হোক, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাকে গোয়ালপাড়িয়া বলে ধরে নেওয়া হলেও তার মধ্যে পূর্ব গোয়ালপাড়িয়া ও কিছু পরিমাণে মধ্য গোয়ালপাড়িয়ার রূপের সঙ্গে অন্যান্য অসমিয়া উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য নেই। কিন্তু রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উভয় দিকেই পশ্চিম গোয়ালপাড়িয়ার এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো অনভ্যস্তজনের পক্ষে সহজে বোধগম্য নয়। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি রূপতাত্ত্বিক দিকের চেয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিক দিকে অধিক প্রকট। উদাহরণস্বরূপ, এই উপভাষায় মূর্ধন্য ট-বর্গ আর দন্ত্য ত-বর্গের বর্ণের স্বতন্ত্র মূর্ধন্য ও দন্ত্য উচ্চারণ আছে, যা অসমিয়ার অন্যান্য উপভাষায় নেই। অনুরূপভাবে, চ ও ছ-র ঘৃষ্ট তালব্য উচ্চারণ অনেকটাই রক্ষিত হয় — যা সাধারণত অসমিয়াতে করা হয় না। আবার, অসমিয়া ভাষার শ, ষ ও স-র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উষ্ম কণ্ঠ্য ধ্বনি এখানে অনুপস্থিত। বরং তিনটি বর্ণের ক্ষেত্রেই উষ্ম তালব্য ধ্বনির প্রাধান্য লক্ষণীয়। সেজন্য পশ্চিম গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের বহু উপাদান বিষয়বস্তু ও রচনারীতির দিক থেকে পূর্ব গোয়ালপাড়িয়া এবং এমন-কি পশ্চিম কামরূপী ও দরঙি লোকগীতের সমগোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি এমন এক বিশেষ ধরনের আবেশের সৃষ্টি করে যা একান্তভাবে এই শ্রেণির গীতের নিজস্ব সম্পদ।

এইখানে আমরা Folkloristics অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসংস্কৃতিতে লোকগীতের স্থান ও তার চরিত্রের বিষয়ে বোঝার চেষ্টা করব।

প্রথাগতভাবে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে লোকসংস্কৃতির যে-চারটি প্রধান ক্ষেত্রকে মান্যতা দেওয়া হয়ে আসছে সেই কয়টির বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

প্রথম ক্ষেত্রটি হচ্ছে লোকসাহিত্য (Folk literature) বা

মৌখিক সাহিত্য (Oral literature)। একেই কেউ-কেউ বাচিক শিল্প (Verbal art) নাম দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন শ্রেণির কাহিনিজাতীয় উপাদান, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ও ছড়া, এবং পড়ে গীতের কথা-অংশ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিকে ইংরেজিতে Social Folk Custom এবং অসমিয়াতে সামাজিক লোকায়ত রীতি-নীতি বলা হয়। এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের মধ্যে আছে লোকায়ত ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক আচার-নীতি, লোকায়ত চিকিৎসা-পদ্ধতি, লোকায়ত খাদ্যাভ্যাস এবং রন্ধনপ্রণালি ইত্যাদি। এর পরে রয়েছে অন্য এক ক্ষেত্র যাকে ইংরেজিতে Physical Folklife বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অসমিয়া নামকরণ আবয়বিক লোকায়ত জীবনচর্যা করা যায়। পুতুল ইত্যাদি সহ নানা ধরনের লোক-ভাস্কর্য, গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম সহ লোকায়ত ভাস্কর্য, বয়ন-শিল্প, বাঁশ-বেতের শিল্প ইত্যাদি— নৃতত্ত্ববিদগণ এগুলিকেই বস্তুগত সংস্কৃতি বা Material Culture নামে অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রটির নাম হচ্ছে লোকায়ত পরিবেশন-শিল্প (Folk Performing Arts) যার মধ্যে লোকসংগীত, লোকনৃত্য আর লোকনাট্য প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এই ক্ষেত্রগুলি পরস্পর সম্পর্কবিহীন ও স্বতন্ত্র নয় : একটা ক্ষেত্রের উপাদানের সঙ্গে অন্য একটা ক্ষেত্রের এক বা একাধিক উপাদানের ওতপ্রোত সম্পর্ক থাকতে পারে। আমার আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার প্রতি লক্ষ রেখে উদাহরণস্বরূপ লোকগীতের বিষয়টিই উত্থাপন করা যেতে পারে। লোকগীতে দুই ধরনের উপাদান যুক্ত হয়ে থাকে। একটা হল তার কথা অংশ, যা লোকসাহিত্যের উপাদান; আর অন্যটা হল সংশ্লিষ্ট গীতের সাংগীতিক বিন্যাস— তার সুর ও ছন্দের বৈশিষ্ট্য। এই দুই প্রকার উপাদানের বিশ্লেষণ করা হলে তবেই প্রকৃতপক্ষে লোকগীতের অধ্যয়ন পূর্ণাঙ্গ হয় বলে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য লোকগীতের সংগ্রহ, শ্রেণিবন্ধন ও অধ্যয়নের অধিকাংশ বিদ্যায়তনিক কর্ম শুধু গীতের কথা অংশকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হতে দেখা যায়, তার সাংগীতিক দিকটি প্রায় উপেক্ষিতই থেকে যায়।

লোকসংগীতের সঙ্গে যুক্ত সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের অধ্যয়নের মধ্য দিয়েও সংশ্লিষ্ট সমাজের ভিতরকার এমন কিছু পরিচয় পাওয়া সম্ভব, যেগুলো শুধু লোকগীতের কথা-অংশ থেকে পাওয়া যায় না। লোকসংগীতকে এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রতিককালে যে-অধ্যয়ন ক্ষেত্রটি বিশ্লেষণ করছে তার নাম হল Ethnomusicology। একে আমরা জাতিসত্তাভিত্তিক সংগীত-বিজ্ঞান বলতে পারি। Ethnomusicology-র এক শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞের নাম হল Allan Lomax। 'Folksong Style And Culture' শীর্ষক Lomax-এর বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থটিতে সংগীতের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে যেভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে তাকে বিরল বলা যেতে পারে। কয়েকটি দেশে Ethnomusicology বিদ্যায়তনিক দিকে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। সেই তুলনায় আমাদের দেশে এটা হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থাতেই রয়েছে।

এই আলোচনার সূত্র ধরে অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের অন্য এক মাত্রা বা আয়তনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় : তা হল সাংগীতিক বিন্যাসের মাত্রা। বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর দিক থেকে যেভাবে অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি সেইভাবে সাংগীতিক বিন্যাসের দিক থেকেও অসমিয়া লোকগীতের বহুবর্ণী চরিত্রকে প্রত্যক্ষ করা যায়। উজান অসম ও নামনি অসমের লোকগীতের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার দুটি মৌলিক ভিত্তি আছে। উজান অসমের লোকগীতে বিহুগীতের কোমল স্বর-আশ্রিত সুরের পঞ্চস্বর যুক্ত গাঁথনির প্রাধান্য। আবার সেখানে রয়েছে বিহু ঢোলের তালের সঙ্গে যুক্ত নিজস্ব ছন্দোবিন্যাসের উপস্থিতি। সে-ক্ষেত্রে নামনি অসমে প্রধানত দোতারার ছন্দের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অধিক স্বরসংযুক্ত জটিল সাংগীতিক গাঁথনি সহজলভ্য। সাংগীতিক বিন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও একটি দিকের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় : তা হল একটি রচনাকে ভিন্ন ভিন্ন context বা সন্দর্ভে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুর-ছন্দে বাঁধা হলে লোকগীতে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে। একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক রসের রচনার উদাহরণ নেওয়া যাক। 'নামে গঙ্গাজল লবলৈ কোমল বৈ আছে হৃদয়র মাজে'— পরম্পরাগত এই রচনাটি গোয়ালপাড়ার পূর্ব অঞ্চলে 'গুপুনী' নামের রূপে গাওয়া হয়, কামরূপে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ লোকগীতের ধুরা বা ঘোষার (ধুয়া) কাজ করে, আবার জিগিরের সাংগীতিক গাঁথনির মধ্যেও একে ধরে রাখা হয়েছে। সেইভাবে 'নাম-ঘোষা'র (মহাপুরুষ শংকরদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব রচিত অসমিয়া বৈষ্ণব ভক্তিগীতি) কিছু রচনা 'নামঘর'-এ (অসমিয়া বৈষ্ণবদের উপাসনাগৃহ) গাওয়া হয়, কখনো

কামরূপী লোকগীতের রূপে পরিবেশিত হয় এবং কখনো স্বরচিত ঘোষা-সহযোগে উজান অসমের গ্রামীণ শিল্পীরা 'টোকারি-গীতের' অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

কথা ও সংগীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল কাহিনি-গীত বা 'মালিতা'গুলি। কাহিনি-গীত অভিধাটি এই সূচিত করে যে এটি একাধারে কাহিনি ও গীত। ইংরেজিতে এটাই ballad নামে পরিচিত। Ballad-এর সংজ্ঞা সহজ কথায় এভাবে দেওয়া হয় : A ballad is a story that is sung or a song that tells a story.

আজকের এই বক্তৃতার মাধ্যমে অসমিয়া লোকগীতের— এবং বিশেষ করে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের— কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হল। আমার এই প্রয়াসে যে বহু অপূর্ণতা, বহু দুর্বলতা থেকে গেছে সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। আমি ধরে নিয়েছি যে আমার বক্তব্যের বিষয়ে শ্রোতাদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়েছে। উদ্যোক্তারা যদি ব্যবস্থা করেন তাহলে আমি তাঁদের সন্দেহ নিরসনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

কিন্তু আজকের বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের সকলের হয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা আমি নিজেই করতে চাইছি। প্রশ্নটা এই ধরনের : বিশ্বের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব প্রান্তের সমস্ত সমাজে পরম্পরাগত স্থানীয় সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা যেন লুপ্ত হয়ে এসেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দুর্দান্ত অগ্রগতির ফলে এবং সেইসঙ্গে বিপণন ব্যবস্থার অভাবনীয় সম্প্রসারণের ফলে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের দ্রুত পশ্চাদপসরণ ঘটছে আর তার স্থান অধিকার করছে আধুনিক নামধারী এক কৃত্রিম ও বায়বীয় চরিত্রের তথাকথিত বিশ্বসংস্কৃতি। এ-রকম ক্ষেত্রে লোকগীতাদি লোকসংস্কৃতির উপাদান নিয়ে মাথা ঘামানোর কিংবা সেগুলি সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সার্থকতা আছে কি?

এর উত্তর দৃঢ়তার সঙ্গে এককথায় দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, লোকসংস্কৃতির মধ্যে এমন এক অদমনীয় জীবনীশক্তি আছে যার সাহায্যে সে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং অনেক সময়ে মৃতপ্রায় উপাদানও ফিনিক্সের মতো নিজেকে পুনর্জীবিত করে। আজকের আধুনিকতার প্রবল স্রোতের মধ্যেও শুধু অনগ্রসর বিকাশশীল সমাজের জন্যই নয়, এমন-কি অগ্রসর ও বিকশিত সমাজ সহ সমগ্র মানব-সমাজের জন্যও, লোকসংস্কৃতির সম্পদগুলিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আমি এখন সেটাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করব সমাজের শুভচিন্তক দুজন গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে। প্রথমজন হচ্ছেন আমেরিকান লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত Alan Lomax যাঁর Folksong Style And Culture নামক গ্রন্থের উল্লেখ আমি একটু আগেই করেছি। আর অন্যজন হচ্ছেন ভারতীয়, অসমিয়া— আধুনিক অসমের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসাধক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা।

প্রথমে Alan Lomax-এর কথা বলা যাক। ইতিমধ্যে উল্লেখিত ১৯৭২ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির এক জায়গায় তিনি আলোচনা করেছেন কীভাবে পশ্চিমী সংস্কৃতির আগ্রাসী আক্রমণ এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতির দুর্বল সংস্কৃতিকে পদদলিত করে নিশ্চিহ্নকরণের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং তার ফলে কীভাবে পৃথিবী থেকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই পরিস্থিতি সমগ্র মানব-সমাজের জন্য এক আতঙ্কময় ভবিষ্যতের সূচনা করেছে। আমরা এমন এক পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছি যেখানে নেই কোনো বিচিত্রতা, নেই কোনো বর্ণিলতা, নেই কোনো বিকল্প আশ্রয়— আছে শুধু এক বর্ণহীন, স্বাদহীন, কৃত্রিম ও নিষ্প্রাণ সমরূপতা। এই বিশ্বটি বাসযোগ্য বিশ্ব হয়ে থাকবে তো? লোকসংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য অনুভবকারী সমস্ত সচেতন মানুষেরই প্রশ্ন এটাই। Lomax-এর নিজের ভাষায় :

"To a folklorist the uprooting and destruction of traditional cultures and the consequent grey-out or disappearance of human variety presents as serious a threat to the future happiness of mankind as poverty, overpopulation, and even war. ...Soon there will be nowhere to go and nothing worth staying at home for. War is wasteful of lives, but only rarely and at its most dreadful does it eradicate a whole way of life. ...Our Western mass production and communication systems are inadvertantly destroying the languages, traditions, cuisines and creative styles that once gave the people of every locality a distinctive character."

সেটা ছিল ১৯৭২ সালের কথা। আর প্রায় একই ধরনের কথা জ্যোতিপ্রসাদও বলেছিলেন তারও অন্তত কুড়ি বছর আগেই।

অসমিয়া সংস্কৃতির স্বকীয়তা রক্ষার চেষ্টাকে প্রাদেশিকতার নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিতকরণপ্রয়াসী অভিমত খণ্ডন করে জ্যোতিপ্রসাদ বলিষ্ঠতার সঙ্গে বলেছিলেন যে বিশ্ব-বৈচিত্র্য রক্ষার খাতিরে এইরকম চেষ্টা শুধু সমর্থনযোগ্যই নয়, এমন-কি অপরিহার্যও। 'অসমিয়া স্থাপত্যর নব রূপ' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন :

"আজ আমরা আমাদের আপন বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য এক বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়তে এগিয়ে এসেছি। সেই কারণেই বিশ্ব-বৈচিত্র্য রক্ষা করতে আমরা আমাদের অসমিয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষার্থে যে-চিন্তা বা কাজ করব তা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা হতে পারে না।"

(*"আজি আমি আমার ঘরুয়া বৈচিত্র্য রক্ষা করিবলৈ এটা বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি গঢ়িবলৈ আগ বাঢ়ি ওলাইছোঁ। সেই কারণেই বিশ্ব-বৈচিত্র্য রক্ষা করিবলৈ আমি আমার অসমীয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষা করিবলৈ যি চিন্তা বা কর্ম করিম সি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা হ'ব নোয়ারে।"*)

আরও একধাপ এগিয়ে জ্যোতিপ্রসাদ বলেছিলেন :

"... এই বিশ্ববৈচিত্র্যের ভাবধারায় সকল জাতি, মহাজাতি, উপজাতি নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়তে এগিয়ে এলে সেখানে আর সংঘর্ষের স্থান কোথায়? সেটা হলেই বাঙালি বা মারাঠিরা যেমন নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাটা কর্তব্য বলে ভাববেন তেমনই অন্যদিকে তাঁদের যে অসমিয়া সংস্কৃতিও রক্ষা করতে হবে সেই কর্তব্যও উপলব্ধি না-করে পারবেন না। অসমিয়া সমতলবাসীরাও তখন আমাদের অসমের উপজাতিদের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে রক্ষা করতে হবে সেটাও ভালো করে বুঝতে পারবেন।"

("... *এই বিশ্ববৈচিত্র্যবোধর ভাবেরে সকলো জাতি, মহাজাতি, উপজাতিয়ে নিজর সভ্যতা-সংস্কৃতি গঢ়িবলৈ আগ বাঢ়িলে তাত আরু সংঘর্ষর ঠাই ক'ত? তেতিয়া হলে বঙালী বা মারাঠীয়ে যেনেকৈ নিজর সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাটো কর্তব্য বুলি ভাবিব আনফালে তেওঁলোকে যে অসমীয়া সংস্কৃতিকো রক্ষা করিব লাগিব সেই কর্তব্যও উপলব্ধি নকরি নোয়ারিব। অসমীয়া ভৈয়মীয়াসকলেও তেতিয়া আমার অসমর জনজাতিসকলর সভ্যতা-সংস্কৃতি যে রক্ষা করিব লাগিব সেই তাকো বুজিব পারিব ভালকৈয়ে।*")

এমন-কি জ্যোতিপ্রসাদ এর মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির স্বপ্নও দেখেছিলেন :

"বিশ্বসংস্কৃতির বৈচিত্র্যবোধ থাকলেই লোকে যাকে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ বলতে চায় তা আর কী করে থাকবে? বিশ্বশান্তির পথও এই দিক দিয়েই।"

(*"বিশ্বসংস্কৃতির বৈচিত্র্যবোধ থাকিলেই যাক সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ লোকে বুলিব খোজে সি আরু কেনেকৈ থাকিব? বিশ্বশান্তির বাটো এই ফালেদিয়েই।*")

জ্যোতিপ্রসাদের এই উক্তিগুলির সূত্র ধরে একটু আগে প্রকাশ্যে উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর আরও একবার নতুন ধরনে খুঁজতে পারি।

প্রশ্নটি ছিল : আজকের globalization বা গোলকায়নের যুগে লোকগীতাদি স্থানীয় সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সার্থকতা আছে কি?

আমাদের উত্তরটা হবে এই ধরনের : গোলকায়ন আর বিশ্বায়ন বা বিশ্বমুখিতা এক বস্তু নয়। আবার প্রকৃত বিশ্বায়নের অর্থ একবর্ণী সমরূপতা নয়, বরং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সহ-অবস্থান ও সহমর্মিতাই। এর মধ্য দিয়ে যেভাবে অঞ্চলগত ও গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়িয়ে চলা সম্ভব, তেমনই মানবকুলের জন্য একান্ত কাম্য অথচ এখন পর্যন্ত সুদূরপরাহত বিশ্বশান্তির সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে।

আমার বক্তৃতার এখানেই অন্ত পড়ছে। আপনাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ❑

[এই নিবন্ধের 'প্রস্তাবনা' অংশের অনুবাদ স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক কৃত]